প্রবন্ধ

বন্দীমুক্তি আন্দোলন : ঐতিহ্য, পরম্পরা ও সাম্প্রতিক বিতর্ক

দীপংকর চক্রবর্তী

❑ এক

সেদিন কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে এপিডিআর-সহ একুশটি গণসংগঠনের উদ্যোগে আয়োজিত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আয়োজিত কনভেনশনটি যখন শুরু হয়েছিল বিপুল ও অনুশ্রী চক্রবর্তীর 'সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই' গানটি দিয়ে, তখন সমবেত পঞ্চাশোত্তর অনেকেরই স্মৃতির দরজায় ঘা দিয়েছিল ১৯৭৭-এর বন্দীমুক্তির দাবিতে উত্তাল আন্দোলনের ঝিলিক। কেননা এই গানটিই কার্যত ছিল সেদিনের সেই ঐতিহাসিক আন্দোলনের থিম সং। স্বভাবতই অনেকের হাতই যেন অনেক দিন পরে আবার মুষ্টিবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। সেই শক্ত মুঠি কিন্তু প্রায় সঙ্গেই সঙ্গেই প্রায় আলগা হয়ে এসেছিল, যখন তাঁদের চৈতন্যে হঠাৎ আবার ঘা দিয়েছিল এই উপলব্ধি যে, *অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ...* আজকে সেই ঐতিহ্য ও পরম্পরাবাহী আন্দোলনে জন্ম নিয়েছে সংশয় ও বিভ্রান্তি। এই পটভূমিকাটিই আজকে এই আন্দোলনের ঐতিহ্য ও পরম্পরাকে নতুন করে আবার তুলে ধরার আবশ্যিকতাকে জরুরি করে তুলেছে। রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি সারা পৃথিবীর গণতান্ত্রিক ও মানবাধিকার আন্দোলনের একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। আমাদের দেশেও এর এক গৌরবময় ঐতিহ্য রয়েছে। *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি*-টি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সর্বজনীন দাবি। রাজনৈতিক মতাদর্শ অনুসরণ ও কার্যকর করার লক্ষ্যে, কিংবা রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্বার্থে কোনো কাজের জন্য, এমনকি সেটা হিংসাত্মক বা প্রচলিত আইনে 'অপরাধ' বলে গণ্য হলেও, কেউ বন্দী হলে সাধারণভাবে তাঁকে 'রাজনৈতিক বন্দী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় এবং তাদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি তোলা হয়। কোনো দেশের শাসকেরা কোনো দিনই এদেরকে 'রাজনৈতিক বন্দী' বলে গণ্য করতে বা তাদের মুক্তি দিতে চায় না। আইরিশ সশস্ত্র বিপ্লবীদের ক্ষেত্রে বা দক্ষিণ আফ্রিকায় নেলসন ম্যান্ডেলাদের ক্ষেত্রেও এই দাবি নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। আমাদের দেশে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসরণ করেছে। শুধু তাই নয়, তার ধারাবাহিকতায় ১৯৪৭-পরবর্তী সমস্ত কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারও এই পথই অনুসরণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অধুনা-বাতিল জেলকোডেও সেরকম বিধান ছিল। সম্ভবত একমাত্র পশ্চিমবঙ্গেই সত্তরের দশকের রক্তাক্ত ইতিহাসের আপাত-অবসানের পর রাজনৈতিক কার্যকলাপের জন্য আটক হাজার হাজার বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে গড়ে-ওঠা উত্তাল আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে আজকের মতোই বিপুল জনসমর্থন নিয়ে ১৯৭৭-এ ক্ষমতায় আসীন বামফ্রন্ট সরকার রাজনৈতিক বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মেনে নেয়। জেল কোডের পরিবর্তন ঘটিয়ে ১৯৯২-এ চালু-হওয়া ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেকশনাল সার্ভিসেস অ্যাক্টেও 'রাজনৈতিক বন্দী'-র উপরোক্ত সংজ্ঞা স্বীকৃতি পায়। মনে রাখা দরকার, এটি অর্জিত হয়েছিল মানবাধিকার ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ফলেই, কেউ দয়া করে এটা ভিক্ষে দেয়নি।

❑ দুই

আমাদের দেশের অতীত ইতিহাসের দিকে তাকালে ধরা পড়বে, ১৯১৯ সালে মানুষের ব্যাপক দাবির প্রেক্ষিতে মন্টেগু-চেমসফোর্ড চুক্তি অনুসারে, 'ফরগিভ অ্যান্ড ফরগেট' দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী সরকার আলিপুর বোমা মামলায় আন্দামানে নির্বাসিত কুখ্যাত সিডিশন অ্যাক্টের ৩এ ধারায় শাস্তিপ্রাপ্ত 'চরমপন্থী' বিপ্লবীদের পর্যন্ত মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল। এর পরে ত্রিশের দশকে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি আবার বিশেষভাবে সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং ১৯৩১-এর গান্ধী-আরউইন চুক্তিতে হিংসাত্মক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত এমন সব বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা না হওয়ার ফলে সারা দেশে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। এর পরে মূলত কংগ্রেস তথা পণ্ডিত নেহরু প্রভৃতির উদ্যোগে ১৯৩৬-এ ভারতের প্রথম সংগঠিত মানবাধিকার সংগঠন 'অল ইন্ডিয়া সিভিল লিবার্টিজ ইউনিয়ন' গড়ে উঠলে, অন্যান্যদের সাথে সাথে 'হিংসাত্মক' কার্যকলাপের সাথে যুক্ত বন্দীদের মুক্তির দাবিও তোলা হয়। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটিও একই মর্মে প্রস্তাব নেয় এবং শেষ পর্যন্ত আন্দামানে নির্বাসিত সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও মুক্তি পান। ১৯৪৭-পরবর্তীকালে ১৯৪৮-এ কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ ঘোষিত হবার পর তাদের বহু কর্মী ও সমর্থককে 'হিংসাত্মক কার্যকলাপের' অভিযোগে ব্যাপকভাবে গ্রেপ্তার করা হয়। মেঘনাদ সাহা, শরৎচন্দ্র বসু, ক্ষিতিপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতির উদ্যোগে তাঁদের মুক্তির দাবিতে জনমত ও আন্দোলন গড়ে ওঠে। সত্তরের দশকে সশস্ত্র বিপ্লবে বিশ্বাসী নকশাল-পন্থীদের মুক্তির দাবিকে কেন্দ্র করেই মূলত গড়ে ওঠে ১৯৪৭-পরবর্তী ভারতের প্রথম সংগঠিত ও ধারাবাহিক মানবাধিকার অধিকার সংস্থা 'গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সমিতি' (এপিডিআর)। জরুরি অবস্থার সময় এপিডিআর-কে নিষিদ্ধ করা হলেও 'বন্দী মুক্তি ও গণদাবি (প্রস্তুতি) কমিটি'-র পতাকাতলে ব্যাপক বন্দী মুক্তি আন্দোলন গড়ে ওঠে, এবং আন্দোলনের চাপে বামফ্রন্ট

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

তাদের নির্বাচনী ইস্তাহারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিতে বাধ্য হয়।

কিন্তু এটা ঘটনা যে, ১৯৭৭-এ বামফ্রন্টের মধ্যেও 'রাজনৈতিক' বন্দী কাকে বলা হবে, তা নিয়ে বিতর্ক ছিল। আগেই বলেছি, সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রণীত তখনও চালু রাজ্য জেল কোড অনুসারে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত কেউ, রাজনৈতিক কাজের অঙ্গ হিসেবে তা করা হলেও, 'রাজনৈতিক' বন্দী হিসেবে স্বীকৃতি পেতো না। আর মানবাধিকার কর্মীদের দাবি ছিল : হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাক বা না থাক, সেটা মূল বিবেচ্য বিষয় হতে পারে না। তাহলে তো ক্ষুদিরাম-কানাই-দীনেশ থেকে শুরু করে সূর্য সেন বা ভগৎ সিং প্রভৃতি সশস্ত্র পথযাত্রী বিপ্লবীরা কেউ 'রাজনৈতিক' বলে স্বীকৃতি পাবার যোগ্য হতেন না! সশস্ত্র পথযাত্রীদের 'রাজনৈতিক বন্দী' হিসেবে স্বীকৃতি দিলে নকশালপন্থীরাও ছাড়া পেয়ে যাবে— এই অজুহাতে সিপিআই(এম) নেতৃত্বের একাংশও কার্যত এই বক্তব্যের বিরোধিতা করতে চাইছিলেন। কিন্তু বামফ্রন্টের শরিক দলগুলি সেই বক্তব্যের সমর্থনে দাঁড়িয়েছিলেন (দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ মন্ডল প্রভৃতি তো এমনকি এপিডিআর, মুর্শিদাবাদ জেলা কমিটি-র সদস্য ছিলেন)। সিপিআই(এম) নেতৃত্বের একাংশও তাঁদের সমর্থন করেছিলেন। সে-সময় আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত বামপন্থী বুদ্ধিজীবী হিসেবে সুপরিচিত অশোক মিত্রের একটি নিবন্ধও (*'আমাদের সন্তান-সন্ততিরা'*— মে ২০১১ সংখ্যা অনীক-এ পুনঃপ্রকাশিত) মানবাধিকার আন্দোলনের দাবির পক্ষে বিপুল জনমত তৈরি করতে ভূমিকা নিয়েছিল। সুশোভন সরকার, সত্যজিৎ রায় প্রমুখ সামনের সারির অধিকাংশ শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা, আজকের মতোই, সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির সমর্থনে সোচ্চার হন (বন্দীমুক্তি আন্দোলনের এই মূল দাবির ধারাবাহিকতা বক্সে-র মধ্যেকার এই দুই সময়ের দুটি আবেদনে প্রতিফলিত হয়েছে)। ফলত শেষ পর্যন্ত ১৯৭৭-এ বামফ্রন্টের নির্বাচনী ইশতেহারে *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবি*-টি অন্তর্ভুক্ত হয়। বামফ্রন্ট আমলেই তারাপদ চক্রবর্তী কমিশনের সুপারিশ অনুসারে নতুন *ওয়েস্ট বেঙ্গল কারেক্শনাল সার্ভিসেস অ্যাক্ট* গৃহীত হয়, এবং তার ২৪ নং ধারায় এই বিধিনিষেধ তুলে দিয়ে, হিংসাত্মক কার্যকলাপের সঙ্গে কেউ যুক্ত থাক বা না থাক, রাজনৈতিক লক্ষ্যে সাধিত যে কোনো আইপিসি অনুসারে শাস্তিযোগ্য বন্দীকেও 'রাজনৈতিক' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

পরবর্তীকালে বামফ্রন্ট সরকার এ রাজ্যে চরম রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাস নামিয়ে আনলেও, অন্তত ১৯৭৭-এ তারা প্রশংসনীয়ভাবে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির প্রতিশ্রুতি পালন

রাজনৈতিক বন্দীমুক্তি আন্দোলন : পরম্পরা

বিবৃতি : ১৯৭৭

আমরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করছি যে, সারা দেশের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক জনমত অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে জাতীয় স্তরে অবিলম্বে জরুরি অবস্থার আগে বা পরে কারারুদ্ধ *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দী* ও *আটক ব্যক্তিদের অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তি*-সহ কয়েকটি দাবির সমর্থনে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।... জাতীয় রাজনৈতিক জীবনে স্থিতিশীল প্রকৃত গণতান্ত্রিক ধারা পুনঃ-প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আমরা সমস্ত গণতান্ত্রিক মানুষের কাছে— তাঁরা ক্ষমতাসীন দলের সঙ্গে থাকুন বা না থাকুন বা সমর্থক হোন— এই দাবিগুলিকে সমর্থন করার জন্য আন্তরিক আবেদন জানাচ্ছি।

সত্যজিৎ রায়, সুশোভন সরকার, সমর সেন, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মৃণাল সেন, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র, বিনয় ঘোষ, বরুণ দে, অশোক মিত্র, মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সতীন চক্রবর্তী, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়,দেবকুমার বসু, অজিত নারায়ণ বসু, বেলা দত্ত গুপ্ত, গৌতম চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি প্রায় দু'শো জন শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী।

তথ্যসূত্র : *Frontier : ১৯ ফেব্রুয়ারি*, ১৯৭৭

একটি আবেদন : ২০১১

যাঁরা তাঁদের রাজনৈতিক আদর্শ অনুসারে সক্রিয়তার কারণে, অর্থাৎ রাজনৈতিক বন্দী হিসেবে পূর্ববর্তী জমানা থেকে আটক রয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনোত্তর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে তাঁদের *সবাইকে অবিলম্বে নিঃশর্তে মুক্তি দেবার জন্য* আমরা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

অশোক মিত্র, মৃণাল সেন, সুকুমারী ভট্টাচার্য, শঙ্খ ঘোষ, মহাশ্বেতা দেবী, তরুণ সান্যাল, বিভাস চক্রবর্তী, অপর্ণা সেন, কবীর সুমন, কৌশিক সেন, অমর মিত্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, দীপংকর চক্রবর্তী, শুভেন্দু দাশগুপ্ত, নবারুণ ভট্টাচার্য, সন্তোষ রাণা, সচ্চিদানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়, মানস জোয়ারদার, নব দত্ত, শতরূপা সান্যাল, সব্যসাচী দেব, রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়া মিত্র, কালিকাপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মণীন্দ্র-নারায়ণ মজুমদার, নব দত্ত, প্রদীপ বসু, মৈনাক বিশ্বাস, প্রণব দে, মেহের ইঞ্জিনিয়ার, বোলান গঙ্গোপাধ্যায়, তরুণ নস্কর, অমিত ভট্টাচার্য, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, নীলাঞ্জন দত্ত, বিপুল চক্রবর্তী, দীপাঞ্জন রায়চৌধুরী, রুশতী সেন, অমিতদ্যুতি কুমার, কুমার রানা, প্রেমাংশু দাশগুপ্ত, শুভাশিস মুখোপাধ্যায়, দেবব্রত পান্ডা, তাপস চক্রবর্তী, সিদ্ধার্থ গুহ রায়, দেবপ্রসাদ রায়চৌধুরী, রণেশ রায়, সঞ্জীব আচার্য, সুমিত চৌধুরী, ভাস্কর গুপ্ত, শুচিব্রত সেন, কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, অনুশ্রী চক্রবর্তী, বাসুদেব ঘটক, অরূপ দাশগুপ্ত, অমিত চক্রবর্তী, সোমা মারিক, প্রসিত দাস, অনুপম বসু, কৌশিক গুহ

❑ জুলাই : ২০১১

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

করেছিল। অবশ্য আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতা সহ বিভিন্ন কারণে সমস্ত বন্দীর মুক্তি বিলম্বিত হয়েছিল, প্রায় দেড় বছর সময় লেগেছিল সমস্ত বন্দীর মুক্তির প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতে। তাছাড়া সেই সুযোগে অবাঞ্ছিত কিছু কুখ্যাত সমাজবিরোধীও কংগ্রেস-সহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের তকমায় মুক্তি পেয়ে গেছিল। কিন্তু সেই অজুহাতে প্রকৃত রাজনৈতিক বন্দীদের আটক রাখা হয় নি। প্রসঙ্গত, আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আন্দোলনেরও দীর্ঘ দিনের ঘোষিত অবস্থান হচ্ছে : কোনো অপরাধী নিষ্কৃতি পেয়ে যাবে— এই অজুহাতে একজনও নিরপরাধ ব্যক্তির যেন শাস্তি বা বন্দীদশা দীর্ঘায়ত না হয়।

❑ তিন

এবারের রাজ্য নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ যেমন চাইছিলেন, ঠিক সে রকমটাই শেষ পর্যন্ত ঘটেছে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল ও মূল— এই দুই কংগ্রেসের জোট এই রাজ্যে ক্ষমতা দখল করেছে। যে বিপুল ব্যবধানে তারা জয়ী হয়েছেন, স্বভাবতই তার মধ্যে দিয়ে নতুন সরকারের প্রতি ব্যাপক মানুষদের বিরাট প্রত্যাশা প্রতিফলিত হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সেই প্রত্যাশা পূরণের কিছু সম্ভাবনা এবং উদ্যোগ গ্রহণে গতিশীলতার ইঙ্গিতও পাওয়া গেছে। কিন্তু যে ক'টি ক্ষেত্রে নতুন সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রাথমিক পদক্ষেপ মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করতে এখনও মূলত ব্যর্থতার ইঙ্গিত দিচ্ছে, তার একটি হলো রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নির্বাচনী ইশতেহারে রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রশ্নটি তুলেছিল এবং 'বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের দ্রুত মুক্তির ব্যবস্থা গ্রহণ' করার বললেও, সাজাপ্রাপ্ত বা বিচারাধীন-দের মুক্তি সম্পর্কে নীরব ছিল। তাছাড়া মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-স্বাক্ষরিত আবেদনপত্রে মনোনীত রিভিউ কমিটির মাধ্যমে বন্দীদের কেসগুলির পর্যালোচনার ভিত্তিতে 'পদক্ষেপ নেবার' প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। স্বভাবতই এই রাজ্যে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে পূর্ব-আলোচিত ঐতিহ্য ও চেতনার পটভূমিকায় তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী ইশতেহারে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বদলে বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির, বা মনোনীত কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কেবল বিনা বিচারে আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি সম্পর্কে পদক্ষেপ নেবার প্রতিশ্রুতির বিরুদ্ধে আগে থেকেই সমালোচনা উঠেছিল।

প্রাক্-নির্বাচনী পরিস্থিতির পটভূমিকাটি একটু দেখে নিলেই এই সমালোচনার উৎস ও কারণ অনেকটাই ধরা পড়বে। পশ্চিমবঙ্গে ২০০৬ থেকে ২০১১-র এপ্রিল পর্যন্ত একের পর এক বিস্ফোরণ ঘটেছে সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম, লালগড় আন্দোলন। কৃষক ও আদিবাসীদের সেই সব লড়াই সাড়া তুলছে নাগরিক সমাজেও। বামফ্রন্ট জমানার ক্রমব্যাপ্ত সিপিআই(এম) পার্টিতন্ত্র তথা ক্রমবর্ধমান রাষ্ট্রীয়/দলীয় সন্ত্রাসের দাপটে কুঁকড়ে-থাকা ব্যাপক মানুষ রুখে দাঁড়িয়েছেন, প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন, শপথ নিয়েছেন— সেই শাসনের অবসান ঘটাবার লক্ষ্যে। অজস্র স্লোগানের সঙ্গে মিশে গেছে সেই ঐতিহ্যবাহী স্লোগান: *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই*। এ বছর ২৯ মার্চ মহাবোধি সোসাইটি হলে এপিডিআর-এর উদ্যোগে এই দাবিকে সোচ্চার করে তোলার জন্য কনভেনশন আয়োজিত হলো। সেই কনভেনশনে উপস্থিত থেকে নিজ নিজ পার্টির প্রাসঙ্গিক বক্তব্য তুলে ধরার জন্য সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও, সিপিআই(এম), তৃণমূল কংগ্রেস প্রভৃতি কোনো প্রধান দলই এলো না। বন্দীমুক্তি প্রসঙ্গে বামফ্রন্টের বর্তমান স্বৈরতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও কার্যকলাপের নিন্দার সাথে সাথে তৃণমূল কংগ্রেসেরও সুনির্দিষ্টভাবে সেখানে সমালোচনা করা হলো— সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির বদলে রিভিউ কমিটির মাধ্যমে পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কেবল রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির প্রতিশ্রুতির জন্য। তারপর ১৪ এপ্রিল মৌলালি যুবকেন্দ্রে বন্দীমুক্তি কমিটি আয়োজিত কনভেনশনেও সমবেত কণ্ঠে দাবি উঠলো : *সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই*। ওই দাবির সমর্থনে সংবাদপত্রে কলাম লিখলেন এই সময়ের বিবেক হিসেবে অভিহিত মহাশ্বেতা দেবী। একই দাবিতে তখন গলা মিলিয়েছেন সবাই— নাগরিক সমাজের কেউই সেই স্লোগানের বিরোধিতা করেন নি।

বিধানসভা নির্বাচনে ব্যাপক মানুষের রায়ে বিধ্বস্ত হয়ে গেল বামফ্রন্ট তথা সিপিআই(এম)। ২০ মে শপথ নেবে নতুন সরকার। ১৬মে একটি মিছিল আয়োজিত হলো এপিডিআর প্রভৃতির উদ্যোগে। আগেই বলেছি, পরবর্তীকালে যারা পার্টিতান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘটিয়ে জনগণের ক্রোধ ও বিরোধিতার লক্ষ্যে পরিণত হয়েছে, সেই বামফ্রন্টও কিন্তু ১৯৭৭-এ বিপুল জনসমর্থনে বিজয়ী হয়ে সরকার গঠন করেছিল, এবং তাদের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে নিঃশর্ত মুক্তি দেবার। এবার তাদের স্বৈরতন্ত্রের অবসানে গঠিত নতুন সরকারও যাতে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সেই একই সিদ্ধান্ত নেয়— সেই অনুরোধ জানিয়ে একটি চিঠি মহাকরণে জমা দিয়ে আসার জন্যই সেই মিছিল। কী আশ্চর্য! হঠাৎ দেখা গেলো, তাদের সেই মিছিলের বিরোধিতা করতে নেমে পড়েছেন তার মাত্র চার সপ্তাহ আগে পর্যন্ত সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে সোচ্চার কিছু আন্দোলনের সাথী। এসএমএস চালাচালি করে তাঁরা জনে জনে বারণ করলেন, সেই মিছিলে যাতে কেউ যোগ না দেয়। এভাবে অন্তত মূল দাবির প্রশ্নে এতদিনের ঐক্যবদ্ধ অবস্থান তাঁরা নিজেরাই শুধু পাল্টে ফেললেন না— তা তাঁরা পাল্টাতেই

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

পারেন— অন্যরাও যাতে পাল্টে ফেলে তার চেষ্টাও শুরু করলেন। বন্দীমুক্তির দাবিতে জনমত তৈরি করার কর্মসূচি নেওয়া দূরের কথা, এই সরকারের প্রতি এই মুহূর্তে সমালোচনা-মূলক কোনো অবস্থান নিতেই তাঁরা কার্যত অস্বীকার করছেন। শুধু তাই নয়, তাঁরা অতীত ইতিহাস বিকৃত করছেন, আন্দোলন-কারীদের কুৎসা করছেন এবং আন্দোলনের ন্যূনতম যেটুকু কর্মসূচি এখনও পর্যন্ত নেওয়া হচ্ছে, সেগুলি যাতে ব্যর্থ হয়, সেজন্য প্রচার চালাচ্ছেন। তাঁদের আপত্তি থাকতেই পারে, কিন্তু তাই বলে এভাবে বিকল্প মতের কর্মসূচিকে চক্রান্তমূলক কায়দায় বানচাল করার চেষ্টা কেন? উত্তর মিললো না। তাঁদের মোটামুটি বক্তব্য যা জানা গেলো: তাঁরা এই মুহূর্তে তৃণমূল কংগ্রেসের বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত এতদিনকার ঐতিহ্য-বিরোধী অবস্থানেরও সমালোচনা করাটা পছন্দ করছেন না, তাদের দেওয়া একান্তভাবেই আংশিক প্রতিশ্রুতিকেই তাঁরা স্বাগত জানিয়ে পরবর্তী কার্যক্রম ঠিক করতে চাইছেন (*পরিশিষ্ট দেখুন*)। এমনকি বন্দীমুক্তি কমিটিতেও কেউ কেউ এ নিয়ে সোচ্চার হয়েছেন, এবং ওই কমিটির সম্পাদকও এই মুহূর্তে সরকার সম্পর্কে কোনো সমালোচনামূলক অবস্থান নিতে অস্বীকার করেছেন। এ প্রসঙ্গে আইনি প্রতিবন্ধকতার ও বাধ্যবাধকতার কথাও তাঁরা তুলছেন (প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯৭৭-এ আইনি অসুবিধে যতোটা ছিল, তার কিছুটা অপসৃত হয়েছে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৮০-তে প্রদত্ত একটি রায়ে (*পাশের বক্স দেখুন*)। ৭ জুন এপিডিআর প্রভৃতির উদ্যোগে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে আয়োজিত গণঅবস্থানের ক্ষেত্রেও তাঁরা একইরকম বিরোধিতা ও তা বানচাল করার প্রচেষ্টা চালিয়ে গেলেন। এভাবেই শুরু হলো পশ্চিমবঙ্গে ঐক্যবদ্ধতার বিরল ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতায় উজ্জ্বল বন্দীমুক্তি আন্দোলনে বিভাজনের প্রক্রিয়া।

❑ চার

এই প্রসঙ্গেই উঠে এসেছে মানবাধিকার আন্দোলনের মৌলিক একটি নীতিগত প্রশ্ন : বর্তমান শ্রেণীভিত্তিক সমাজব্যবস্থার প্রেক্ষিতে কোনো সরকার বা রাজনৈতিক দলের সঙ্গে মানবাধিকার আন্দোলনের বা প্রকৃত অর্থে মানবাধিকার সংগঠনের সম্পর্ক কী হবে? যে কোনো দেশের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটি আবশ্যিক মৌলিক ভিত্তিভূমি হচ্ছে সরকার-নিরপেক্ষতা। কেননা এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে জনমত ও সাধ্যমতো লড়াই গড়ে তোলা। সরকার হচ্ছে সেই রাষ্ট্রেরই বশংবদ চালক। সে কারণেই এই আন্দোলনের দিক্‌নির্দেশ ও কর্মসূচি অবশ্যই গড়ে তোলা দরকার এমনভাবে, যাতে সরকারের বা সরকারি দলের স্বার্থ নয়, মানবাধিকারই সব সময়ে সার্বিক ও সর্বাধিক গুরুত্ব পায়। তাই মানুষের অধিকার রক্ষার পক্ষে সরকারের কোনো পদক্ষেপকে অভিনন্দন জানাতে যেমন দ্বিধা রাখার যুক্তি নেই, ঠিক তেমনি সরকারের কোনো ভ্রান্ত পদক্ষেপকে সমালোচনা করার বা স্বৈরতান্ত্রিক প্রবণতাকে নিন্দা করারও তার বিরুদ্ধে সাধ্যমতো জনমত ও আন্দোলন গড়ে তোলার প্রশ্নেও কোনোরকম আপসকে প্রশ্রয় দেওয়াটা হবে খুবই গুরুতর বিচ্যুতি।

পশ্চিমবঙ্গে বিগত শতকের সত্তরের প্রথমে যখন সংগঠিত মানবাধিকার আন্দোলনের অনুশীলন শুরু হয়েছিল, তখন সরকার ও আন্দোলনের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সঠিক দৃষ্টিভঙ্গিই মূলত অনুসৃত হয়েছিল। তৎকালীন কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে অনেক সময়েই এই আন্দোলন ও সরকার-বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি লড়াইয়ের একই দিকে থেকেছে। তাই বলে নির্বাচনের সময় মানবাধিকার আন্দোলনের কর্মীরা বিরোধীদের সাংগঠনিকভাবে সার্বিক সমর্থন জানান নি (একমাত্র কোন দলীয়

মামলা প্রত্যাহার সম্পর্কে সুপ্রিম কোর্টের রায়

প্রসঙ্গ: রাজেন্দ্র কুমার জৈন বনাম বিহার রাজ্য

২ মে : ১৯৮০

অনুচ্ছেদ ১৪॥ যথোপযুক্ত প্রমাণের অভাবের কারণেই যে শুধু পাবলিক প্রসিকিউটর কর্তৃক অভিযোগ প্রত্যাহৃত হতে পারে তা নয়, এবং এ সম্পর্কে এই আদালতের পূর্ব-নজিরের কথা আমরা আগেই বলেছি। অতীতে আমরা বহু সময়েই দেখেছি যে, গণআন্দোলন, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, আঞ্চলিক বিবাদ, ছাত্রবিক্ষোভ প্রভৃতি কারণে জনস্বার্থেই পাবলিক প্রসিকিউটরের পক্ষে অভিযোগ প্রত্যাহার করাটা যুক্তিযুক্ত ও প্রয়োজনীয় হয়ে উঠতে পারে। যেখানে ভাবাবেগের প্রশ্ন জড়িত এবং বাস্তব পরিস্থিতিতে হিংসাত্মক প্রবণতার আধিক্য বর্তমান, সেখানে অনেক সময়েই শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বাস্তব পরিবেশকে হিংসাত্মক প্রবণতার আধিক্য থেকে মুক্ত করে বিবদমান বিষয়-গুলির শান্তিপূর্ণ মীমাংসা, এবং ঝড়ের পরের শান্ত পরিস্থিতি বজায় রাখার লক্ষ্যে অভিযোগ প্রত্যাহার করা দরকার হয়ে পড়ে। ভাবাবেগের প্রশ্ন জড়িত থাকার পটভূমিকায় আইনি বিধানের কড়াকড়ির ফল এমনকি হিতে বিপরীত হতে পারে। শুভেচ্ছামূলক একটি পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য কিংবা বিরাজমান শান্ত পরিস্থিতি যাতে বিঘ্নিত না হয় সেই উদ্দেশ্যে নির্বাচিত একটি সংবেদনশীল ও জনগণের অনুভূতি ও ভাবাবেগের প্রতি সহানুভূতিশীল সরকার যদি অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে আর মামলা না করলে বা ইতিমধ্যে শুরু হয়ে যাওয়া মামলা আর না চালালে সেটা খুবই যুক্তিযুক্ত হতে পারে। এই পরিস্থিতিতে মামলা করা বা চালানো ক্ষতিকারক না অনুকূল হবে, সরকার ছাড়া কে সেটা সবচেয়ে প্রাথমিকভাবে ঠিক করতে পারে, বা ঠিক করা উচিত! সরকার যদি সিদ্ধান্ত নেয় যে, জনস্বার্থেই মামলা প্রত্যাহার করা উচিত, তাহলে কীভাবে তার পক্ষে আর সেটা চালিয়ে যাওয়া সম্ভব?

তথ্যসূত্র: AIR 1980, p.1510 to 1524, (para 14)

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ছাপহীন প্রার্থী অশোক মিত্রকে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সোচ্চার ইতিবাচক ভূমিকার কারণে এপিডিআর কলকাতার রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কেন্দ্রে সমর্থন জানিয়েছিল), কিংবা ১৯৭৭-এ বিরোধীরা, অর্থাৎ বামফ্রন্ট যখন ক্ষমতাসীন হলো, রাতারাতি তাদের পক্ষভুক্ত হয়ে যান নি। আন্দোলনের চাপে সেই সরকারের প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্তকে যেমন তাঁরা অভিনন্দন জানিয়েছেন, ঠিক তেমনি সেই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ক্ষেত্রে সরকারের প্রাথমিক পর্যায়ে আমলাতান্ত্রিক দীর্ঘসূত্রিতা ও গড়িমসির বিরুদ্ধে মিছিল করে প্রতিবাদ জানাতে দ্বিধা করেন নি। আবার সেই সরকারই যখন পরবর্তীকালে স্বৈরতন্ত্রের প্রবণতা দেখাতে এবং মানুষের অধিকারের উপর আক্রমণ শুরু করলো— সিঙ্গুর-নন্দীগ্রাম লড়াইয়ের কিংবা তৃণমূল কংগ্রেসের জন্মের বা রাজ্যের ব্যাপক নাগরিক সমাজ পথে নামার অনেক আগে— তখনই তাঁরা সেই আক্রমণের বিরুদ্ধে সাধ্যমতো লড়াই শুরু করেছেন।

এরই ধারাবাহিকতায় গত প্রায় পাঁচ বছরের সারা রাজ্য-জোড়া গণজাগরণের প্রেক্ষিতে সব সময়েই সামনের সারিতে থেকেছেন মানবাধিকার কর্মীরা। ব্যক্তিগতভাবে কেউ কেউ স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সরকার-বিরোধী প্রধান রাজনৈতিক শক্তির পক্ষে প্রচারে অংশ নিলেও, সামগ্রিকভাবে মানবাধিকার কর্মীরা মূলত দল-নিরপেক্ষই থেকেছেন। কিন্তু ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে নতুন সরকার গঠিত হবার সম্ভাবনা তৈরি হতেই একটি উল্লেখযোগ্য অংশ কার্যত তাদের পক্ষে চলে গেছেন (ঠিক যেমন আগের জমানাতেও দেখেছি, বামপন্থার চরম বিরোধী বেশ কিছু লোক প্রায় রাতারাতি 'বাম'-সমর্থক হয়ে গিয়েছিলেন)। আর নির্বাচনে মমতার নেতৃত্বে তৃণমূল ও মূল কংগ্রেস জোট জয়ী হয়ে সরকার গঠনের পরে তাঁরা এই মুহূর্তে নব-নির্বাচিত সরকারকে 'বিব্রত' করতে তো চাইছেনই না, উপরন্তু যারা সেটা করতে চাইছেন, অগণতান্ত্রিকভাবে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রচারে নেমে পড়েছেন। ফলত এই রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলনের ক্ষেত্রে তৈরি হয়েছে এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতি। মানবাধিকার আন্দোলনের দাবি অনুসারে ১৯৭৭-এর বামফ্রন্ট সরকারের মতো এই নবনির্বাচিত সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে নি। যে বামফ্রন্ট সরকারকে (সঠিকভাবেই) স্বৈরতান্ত্রিক বলে চিহ্নিত করে তাদের সর্বাত্মক বিরোধিতার ফলে আজকের শাসক দলের ক্ষমতায় বসার সুযোগ মিললো, তাদের গৃহীত প্রথম সঠিক ও ইতিবাচক পদক্ষেপটি এই সরকার তো নেয়ই না, তার উপর প্রতিটি বন্দীর মুক্তির বিষয়টি বিবেচনা করবার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সম্পূর্ণভাবে সরকার-মনোনীত একটি রিভিউ কমিটির উপর । তার চেয়েও বড়ো কথা, মুক্তির প্রশ্নেও যে সব বিষয়কে বিবেচনা করা হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে, সেগুলিও এক কথায় অযৌক্তিক ও অপমানজনক। গেজেট বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, অন্যান্য বিষয়ের সাথে সাথে কমিটি দেখবে— বন্দীরা সংশোধনাগারে কীভাবে কাটিয়েছেন! অর্থাৎ স্পষ্টতই এক্ষেত্রে নির্ভর করা হবে স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রযন্ত্রের বিগত জমানারই বিশ্বস্ত আমলাদের ও সান্ত্রীদের রিপোর্টের উপর। এখানেই শেষ নয়, বিবেচনা করে দেখা হবে— বন্দীরা মুক্তি পেলে কীভাবে থাকবেন এবং আবার যে 'অশান্তি' পাকিয়ে তুলবেন না— সে সম্পর্কে নিশ্চিতি আছে কিনা। অর্থাৎ কার্যত 'মুচলেকা' দিতে হবে। গণতান্ত্রিক নাগরিক সমাজ এই অপমানজনক শর্ত দেখেও নীরব থাকবে? ট্র্যাজেডি এটাই যে, আগেই বলেছি, অধিকাংশ মানবাধিকার কর্মী সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির ঐতিহ্যগত দাবির অবস্থানে এবং সরকারের আরোপিত শর্ত-গুলির সমালোচনায় অবিচল থাকলেও, কেউ কেউ বন্দীমুক্তির দাবিতে জনমত তৈরি করার কর্মসূচি নেওয়া দূরের কথা, এই সরকারের প্রতি সমালোচনামূলক কোনো অবস্থান নিতেই অস্বীকার করছেন।

এ প্রসঙ্গে দুটি পূর্ব-দৃষ্টান্ত মনে পড়ছে। জরুরি অবস্থার সময় জয়প্রকাশ নারায়ণের উদ্যোগে গঠিত পিইউসিএল স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সর্বভারতীয় স্তরে আন্দোলনের বিকাশে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। কিন্তু ১৯৭৭-এ ইন্দিরা স্বৈরতন্ত্রের পরাজয় ও কেন্দ্রে ও অনেকগুলি রাজ্যে জনতা সরকার গঠিত হবার কয়েক মাসের মধ্যেই পুলিশের গুলিতে ছত্তিশগড়ে ১২ জন খনিশ্রমিক এবং কানপুরের স্বদেশি মিলে দু'জন শ্রমিকের মৃত্যু হলেও, 'কংগ্রেসের প্রত্যাবর্তনের সুবিধে হয়ে যাবে'— এই অজুহাতে তখন পিইউসিএল-এর সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক কৃষ্ণকান্ত তার নিন্দা বা প্রতিবাদ করতে অস্বীকার করেন। আবার ১৯৭৯-তে পশ্চিমবঙ্গের মরিচঝাঁপিতে পুলিশ নারকীয় গণহত্যা সংঘটিত করলেও পিইউসিএল-এর সভাপতি তারকুন্ডে ওই এই একই অজুহাতে তা নিয়ে তদন্তের প্রতিশ্রুতি দিয়েও শেষ পর্যন্ত তাতে অংশ নিতে এবং এই চরম মানবাধিকার ভঙ্গের ঘটনার বিরোধিতা বা নিন্দা করতে অস্বীকার করেন। তা নিয়ে দেশ জুড়ে মানবাধিকার কর্মীরা বিতর্ক শুরু করেন। দিল্লীর পিইউসিএল-এ আগে থেকেই কিছু দ্বন্দ্ব ছিল, এই বিতর্কের প্রেক্ষিতে তাঁরা আলাদা সংগঠন পিইউডিআর গঠন করেন। এবং সারা দেশে এই ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয় যে, সরকার-নির্ভর বা দল-নির্ভর মানবাধিকার আন্দোলনের ধারণা মানবাধিকারের মৌলিক মতাদর্শের বিরোধী। পশ্চিমবঙ্গের মানবাধিকার আন্দোলনেও এতোদিন এই দৃষ্টিভঙ্গিই অনুসৃত হয়ে এসেছে।

উল্লেখ্য যে, বামফ্রন্ট সরকারের সূচনাপর্বে সরকার এ ব্যাপারে মূলত অভিনন্দনযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। সে সময়েও রাজ্যপ্রশাসনের কিছু আমলা, এবং এমনকি তৎকালীন কেন্দ্রীয়

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী চরণ সিং পর্যন্ত প্রতিটি কেস পর্যালোচনার ভিত্তিতেই কেবল তাদের মুক্তির কথা বিবেচনা করতে বলেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসু তখন তাদের সেই প্রস্তাবকে 'খামোকা টালবাহানার কৌশল' বলে নাকচ করে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির উপর গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দেন। বস্তুত তবুও বিশেষত স্বরাষ্ট্র দপ্তরের কিছু আমলা বিভিন্ন খুঁটিনাটি নিয়ে নানা রকম প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছিল, এবং সেকারণে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তি বিলম্বিত হচ্ছিল। তার বিরুদ্ধে তখন বহু মিছিল বেরিয়েছিল, কেউ সেই প্রতিবাদী কর্মসূচির প্রকাশ্যে বা গোপনে বিরোধিতা করে নি। সরকার গঠনের আগে পর্যন্ত আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শরিক দলগুলির নেতারা— দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভক্তিভূষণ মন্ডল প্রভৃতি— সরকারে থেকে প্রত্যক্ষ আন্দোলনে যোগ দেবার ব্যাপারে তাঁদের 'অসহায়তা'-র কথা বলেছিলেন। সরকার তখন বিষয়টির দায়িত্ব স্বরাষ্ট্র থেকে নিয়ে আইন দপ্তরের হাতে তুলে দিয়েছিল। অন্ধ্রের পার্বতীপুরম ষড়যন্ত্র মামলা এবং বিহারের অনেক মামলায় অনেক জটিলতা থাকা সত্ত্বেও, সরকার বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে সেগুলির সমাধান করেছিল। তবে চতুর্থ ট্রাইব্যুনালে অভিযুক্তদের (অনন্ত সিং প্রভৃতি) বামফ্রন্ট প্রথমে 'রাজনৈতিক' বন্দী বলে স্বীকার করতে আপত্তি জানিয়েছিল, কিন্তু জনমত ও আন্দোলনের ফলে তাঁদেরকেও সরকার মুক্তি দেয়। ফলত বন্দীদের মুক্তির ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।

অন্য দিকে, বর্তমান সরকার একেই আন্দোলনের ঐতিহ্যগত সমস্ত বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মেনে নেয় নি। তার উপর মর্যাদা হানিকর শর্ত আরোপ করলে এবং আমলাতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করলে মানবাধিকার আন্দোলন নীতিগতভাবেই কোনোভাবে তাকে সমর্থন করতে পারে না। মূল প্রশ্নটা এটাই : নিঃশর্ত বন্দীমুক্তি, না শর্তাধীন বন্দীমুক্তি? জনমত গঠন ও প্রয়োজনমতো আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তিকে সুনিশ্চিত করা সম্ভব হবে কিনা— এটাই এই মুহূর্তে এ রাজ্যের মানবাধিকার আন্দোলন সংগঠন ও কর্মীদের সামনে হয়ে উঠছে একটি অগ্নিপরীক্ষা। অধিকার আন্দোলনের একটি মৌলিক ও প্রধান স্লোগান হচ্ছে : ভিক্ষে করে বা আবেদন-নিবেদনের মাধ্যমে অধিকার অর্জিত হয় না— অর্জিত হয় সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে। এই মুহূর্তে আন্দোলনের মধ্যেকার দুঃখজনক বিভাজন নিঃসন্দেহে সে পথে একটি প্রধান বাধা। দীর্ঘ দিন এই আন্দোলনে যাঁরা এক সাথে পথ হেঁটেছেন, অবশ্যই সবিশেষ চেষ্টা চালাতে হবে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মধ্যে তাঁদেরকে আবার যুক্ত করার। কিন্তু তাই বলে সরকারের প্রতি মোহ বা ব্যক্তি-মোহকে প্রশ্রয় দেওয়াটা হবে অনৈতিক— নীতিতে অবিচল থেকেই ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়ার, এবং সুনিশ্চিতভাবেই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর অবিলম্বে নিঃশর্ত মুক্তির দাবি অর্জন করার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে।

সংযোজন ❑ এই নিবন্ধটি শেষ করার সমসময়ে গত ১১ ও ১৪ জুলাই কলকাতায় যথাক্রমে এপিডিআর-সহ ২২টি গণ-সংগঠনের এবং বন্দীমুক্তি কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দু'টি কনভেনশনের প্রস্তাবেই মূল দাবি ছিল "সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই"। দু'টি কনভেনশনেই প্রায় সমস্ত বক্তা এই দাবিকে সামনে রেখে সরকারের কাছে বন্দীদের নিঃশর্ত মুক্তির নীতি ঘোষণার, অবমাননাকর শর্তগুলি বাদ দেবার এবং দাবি আদায়ের জন্য ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের আহবান জানিয়েছেন। আমরা এই ঐক্যবদ্ধ প্রবণতাকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

পরিশিষ্ট

কী বলছেন 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি'-র বন্ধুরা?

প্রাক্-নির্বাচন পর্বে প্রত্যক্ষভাবে সিপিআই(এম)-এর প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে সংগঠিত 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি' কর্তৃক বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিতর্ক প্রসঙ্গে প্রকাশিত পুস্তিকাটির শিরোনাম : 'মানবাধিকারের রাজনীতি, না মানবাধিকার নিয়ে রাজনীতি?'

ওপরের শিরোনামটি বন্দীমুক্তি সম্পর্কিত সাম্প্রতিক বিতর্কে প্রাক্-নির্বাচন পর্বে প্রত্যক্ষভাবে সিপিআই(এম)-এর প্রত্যাবর্তনের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে সংগঠিত 'ফ্রেন্ডস অফ ডেমোক্র্যাসি' কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকার। যদিও তাঁরা পুস্তিকার শুরুতেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, এ-সম্পর্কে মানবাধিকার আন্দোলনের মধ্যে 'কোনো মতবিরোধ নেই'। এই দাবিটি যে হাস্যকর, তা বলার অপেক্ষা রাখে না, আমাদের মূল প্রবন্ধের মধ্যেই মূল বিরোধের বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

১) পুস্তিকায় দাবি করা হয়েছে: ১৯৭৭-এ বামফ্রন্ট সরকারও 'বন্দীমুক্তির জন্য' একটি কমিটি তৈরি করেছিল। ঠিকই বলেছেন তাঁরা— 'কমিটি'টি (তবে আমাদের ধারণা ছিল, এবং তার অন্যতম সদস্য দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ও জানালেন, মন্ত্রীসভার ক্যাবিনেটের চার সদস্যকে নিয়ে যা তৈরি হয়েছিল, সেটি প্রকৃতপক্ষে ছিল একটি ক্যাবিনেট সাব-কমিটি) 'বন্দীমুক্তির জন্য'ই তৈরি একটি পুরোপুরি সরকারি কমিটি। সেই সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, আর সেই সাব-কমিটির উপর দায়িত্ব ছিল তা কার্যকর করার। কিন্তু এবার আধা-সরকারি রিভিউ কমিটিটি তৈরি হয়েছে কোনো বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা তা পর্যালোচনার জন্য, এবং সেটাও সদস্যদের ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে নয়, গেজেট বিজ্ঞপ্তিতে নির্দিষ্ট করে দেওয়া টার্মস অফ রেফারেন্সের

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

ভিত্তিতে। আর নকশালপন্থীদের ক্ষেত্রে মূলত পুরোপুরি বেসরকারি-ভাবে, বন্দীমুক্তি ও গণদাবি (প্রস্তুতি) কমিটির দেওয়া তালিকার ভিত্তিতে। সে তালিকা যাতে সুষ্ঠভাবে তৈরি হয়, সেজন্য সেই কমিটির প্রতিনিধিদের জেলে জেলে ঘুরে বন্দীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছিল। দুটো কি এক হলো?

২) পুস্তিকায় সঠিকভাবেই দাবি করা হয়েছে: ১৯৭৭-এ সবার মুক্তির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও মুক্তির প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় নি। ঠিকই, সবার মুক্তি পেতে পেতে প্রায় দেড় বছর সময় লেগে গিয়েছিল। অনেক তথ্যও তাঁরা এ সম্পর্কে দিয়েছেন। ঢালাও মুক্তির সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত, এবং এমনকি স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর সমস্ত আমলাতান্ত্রিক প্রতিবন্ধকতাকে 'খামোকা টালবাহানার কৌশল' বলে নাকচ করে দিয়ে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের আশু মুক্তির উপর গুরুত্ব দিতে নির্দেশ সত্ত্বেও, প্রধানত আমলাদের বাধা এবং অন্যান্য টালবাহানার কারণে প্রচণ্ড বিলম্বিত হয়েছিল সবার মুক্তি। অবশ্য শেষ পর্যন্ত সবারই মুক্তি কিন্তু মিলেছিল। কিন্তু এবার মুক্তির কোনো সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত না থাকার ফলে, আমাদের ধারণামতো, প্রথমত, সবার মুক্তি পাবার কোনো গ্যারান্টিই মিলছে না; এবং দ্বিতীয়ত, সেই প্রক্রিয়া আরো অনেক বেশি বিলম্বিত হবার বাস্তব আশংকা থেকেই যাচ্ছে। তবে 'ফ্রেন্ডস'-এর সোৎসাহ সমর্থনের উপর নির্ভর ক'রে মমতার সরকার দেশে দেশে সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিগত সাড়ে চারশো বছরের অভিজ্ঞতাকে ভুল প্রমাণ করে দিয়ে যদি সংসদীয় ব্যবস্থার অন্তর্নিহিত আমলাতান্ত্রিকতাকে পুরোপুরি অতিক্রম করে ফেলতে পারে, তবে সেটা তো সত্যিই অভিনন্দন জানাবার মতো অভূতপূর্ব একটি ঘটনা হবে!

৩) অনেক রাজনৈতিক কর্মী জেলে থাকা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে পূর্ববর্তী সরকার অবশ্যই অন্যায়ভাবে তাঁদের 'রাজনৈতিক' স্বীকৃতি দেয় নি, ফলে মুক্তির প্রশ্নে জটিলতা থেকে যাচ্ছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেয় নি ঠিকই, তবে একেবারে না দিয়ে থাকলে সদ্যগঠিত রিভিউ কমিটি যে সর্বমোট একশোর কাছাকাছি 'রাজনৈতিক' স্বীকৃতি-যুক্ত বন্দীদের মুক্তির সুপারিশ ইতিমধ্যেই করেছেন, তাঁরা কোথা থেকে এলেন, কে তাঁদের স্বীকৃতি দিলো— এ সব প্রশ্নের উত্তর কিন্তু মিলছে না!

৪) তাছাড়া মুক্তির প্রশ্নে আরও যে সব আইনি জটিলতা ও সমস্যা আছে, পুস্তিকাতে সে সব কথাও বলা হয়েছে। আমরাও তো সে দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছি। এই ব্যবস্থার মধ্যে যে-ই ক্ষমতায় আসুক, তাঁর যতোই শুভেচ্ছা থাক, তাঁকে আমলাতন্ত্রের নাগপাশে মূলত আবদ্ধ হতেই হবে। এটাই ইতিহাসের শিক্ষা। তবে আসল কথা, কাজটা করার ইচ্ছে আছে কিনা, এবং তার জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি নিয়ে কাজে নামা হয়েছে কিনা। সিঙ্গুরে কৃষকদের জমি ফেরত দেবার সিদ্ধান্ত সঠিক হলেও অতিরিক্ত তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে। পরবর্তীকালে অধঃপতিত হলেও, অন্তত বন্দীমুক্তির সিদ্ধান্ত কার্যকর করার ব্যাপারে বামফ্রন্ট সরকারের সদিচ্ছা ছিল, এবং মোটামুটি আঁটঘাট বেঁধেই তারা কাজে নেমেছিল বলে, বিলম্বিত হলেও সমস্ত বন্দীর মুক্তির ব্যবস্থা করতে পেরেছিল। আর বর্তমান সরকার তো সমস্ত বন্দীকে মুক্তি দেবার সিদ্ধান্তই নেয় নি। তাই 'গণতন্ত্রের বন্ধুদের' আইনি প্রতিবন্ধকতার উপর সবিশেষ গুরুত্ব দেবার অজুহাত তুলতে হচ্ছে। এ সব প্রতিবন্ধকতা ১৯৭৭-এ ছিল না? তবু তো বিশেষ পরিস্থিতিতে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনবোধে আদালত থেকে অভিযোগ প্রত্যাহার করার অনুকূলে সুপ্রিম কোর্টের ১৯৮০ সালের সুস্পষ্ট রায় এবং ১৯৯২-এ এই রাজ্যে জেল কোড বাতিল করে কার্যকর নতুন আইনে 'হিংসা-অহিংসা'-র প্রশ্নটিকে বন্দীদের 'রাজনৈতিক' স্বীকৃতি দেবার ক্ষেত্রে বিবেচনায় না আনার বিধি ১৯৭৭-এ ছিল না। আজ সেই অতিরিক্ত অনুকূল অবস্থাটি রয়েছে। এই নতুন আইনে আর একমাত্র আদালত বা সাজাপ্রাপ্তদের ক্ষেত্রে আইজি (প্রিজনস্)-কে এই স্বীকৃতি দেবার বিধি কিছু নতুন জটিলতাও সৃষ্টি করছে।

৫) পুস্তিকাটিতে বলা হয়েছে : ১৯৭৭ আর ২০১১-র পরিস্থিতি কোনোভাবেই তুলনীয় নয়। তাই কি? কোনো পরিস্থিতিরই কখনও একই চরিত্র ও একই মাত্রা-সহ পুনরাবৃত্তি ঘটে না। তাই একমাত্র ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞরাই সেরকমটা দাবি করে থাকে। বন্দীমুক্তির প্রশ্নে বর্তমান সরকারের অবস্থান সম্পর্কে কোনো সমালোচকই ইতিহাস সম্পর্কে অত অজ্ঞ ধরে নেওয়াটা ঠিক নয়। তাই বলে মৌলিক প্রশ্নে দুই সময়কালের মধ্যে সাদৃশ্য কি সত্যিই নেই? সত্তরের দশক, বিশেষত জরুরি অবস্থার সময়কালে প্রতিষ্ঠিত ছিল কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্র, মানুষ তার বিরুদ্ধে ভোটকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সেই জমানার অবসান সূচিত করেছিল। পশ্চিমবঙ্গে বামফ্রন্টের ৩৪ বছরের শাসনের বিশেষত শেষ পঁচিশ বছরে কায়েম হয়েছিল সিপিআই(এম)-এর পার্টিগত স্বৈরতন্ত্র। পশ্চিমবঙ্গের ব্যাপক সাধারণ মানুষ ও নাগরিক সমাজের প্রধান অংশেরই উপলব্ধি এটা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অসংখ্য বক্তৃতায়, এমনকি 'ফ্রেন্ডস্ অফ ডেমোক্র্যাসি'-র প্রাক্-নির্বাচনী প্রচারে বার বার এই একই উপলব্ধির কথা ("বিসর্জন দিতে হবে স্বৈরাচারী, গণহত্যাকারী, মানবতা-বিবর্জিত আমলাতান্ত্রিক বাম শাসনকে" : 'ফ্রেন্ডস্ অফ ডেমোক্র্যাসি'-র *দাবিপত্র*) প্রতিফলিত হয়েছে। বস্তুত এই উপলব্ধিই ছিল বাম শাসনের বিরুদ্ধে এবারকার বিপুল জনাদেশের মূল উৎস। হঠাৎ আজ কেন বদলে গেল তাঁদের এই উপলব্ধি! সেই মূল ও সঠিক উপলব্ধির প্রেক্ষিতে যুক্তিযুক্তভাবেই দাবি তুলতে হবে : ১৯৭৭-এ কংগ্রেসি স্বৈরতন্ত্রের অবসানে যেমন 'জেনারেল অ্যামনেস্টি'-র ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি উত্থাপিত ও কার্যকর হয়েছিল, আজও তেমনি সিপিআই(এম)-স্বৈরতন্ত্রের অবসানে একই ভিত্তিতে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবি কার্যকর করা হোক? তবে 'ফ্রেন্ডস্' ভোটের আগে নিঃশর্ত মুক্তির দাবির শরিক হলেও, শাসক দলের বিরুদ্ধে গিয়ে আজ তা নিয়ে বিশেষ সোচ্চার হওয়াটা যে কোনো কারণেই হোক, সম্ভাবত সমীচীন মনে করছেন না।

৬) তাছাড়া নিঃশর্ত মুক্তি ও 'বিবেকের বন্দী' হিসেবে মুক্তি নিয়ে বিতর্কটিকেও অনর্থক টেনে আনা হয়েছে। পুস্তিকাটিতেই স্বীকার করা হয়েছে যে, ২০০৯-এ কলকাতায় সিডিআরও-র সভায় প্রয়াত তাত্ত্বিক বালাগোপালের প্রাসঙ্গিক বক্তব্যকে এপিডিআর-এর প্রতিনিধিরা 'তীক্ষ্ণভাবে খণ্ডন করেছিলেন'। এপিডিআর তো সেই অবস্থান থেকে

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com

সরে আসে নি! অন্তত পশ্চিমবঙ্গে তা নতুন করে উত্থাপনের তাৎপর্য কী? এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে, গত ৭ জুন 'একদিন' পত্রিকায় বালাগোপালের এই সম্পর্কিত বক্তব্য বলে যে লেখাটি বেরিয়েছে, সেটি মূল লেখার সংক্ষিপ্তায়ন (যদিও তা স্বীকার করা হয় নি), এমনকি বক্তব্যেরও কিছুটা বিকৃতায়নও।

৭) তবুও, বর্তমান সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবি মেনে না নিয়ে, উপরন্তু অপমানজনক শর্তে মুক্তির কথা বিবেচনা করার সিদ্ধান্ত নিলেও, তার মধ্যেও 'ফ্রেন্ডস্' খুঁজে পেয়েছেন এক 'আশার আলো', 'রূপোলি রেখা'। আমাদের হয়তো দুর্ভাগ্য বা দৃষ্টিশক্তির অভাব যে, আমরাই সেটা দেখতে পাচ্ছি না! তাঁদের বক্তব্য, সবার নিঃশর্ত মুক্তির দাবি মেনে না নিলেও অন্তত ইস্যুটির স্বীকৃতি মিলেছে, 'যোগ্যতম' ব্যক্তিদের নিয়ে রিভিউ কমিটি তৈরি হয়েছে— এটুকু অগ্রগতিকে আমাদের অস্বীকার করা উচিত হবে না। 'ফ্রেন্ডস্'-কে নিয়ে মুস্কিল দাঁড়িয়েছে এটাই যে, তাঁরা বিষয়টিকে মজুরি নিয়ে দর-কষাকষির প্রক্রিয়ার সঙ্গে গুলিয়ে ফেলেছেন। প্রশ্নটি গুণগত— পরিমাণগত নয়, প্রশ্নটি নীতির— দর-কষাকষির নয়। 'নিঃশর্ত' মুক্তির দাবির বদলে প্রাথমিকভাবে 'শর্তাধীন' মুক্তিকে মেনে নেবার তাই প্রশ্ন উঠতে পারে না। অন্তত কোনো নীতিনিষ্ঠ মানুষ সেটা মেনে নিতে পারে না। এরকম অবস্থায় পড়লে তাঁরা কী করতেন জানি না, তবে বর্তমান নিবন্ধকারকে যখন ১৯৭৫-৭৭-এ জরুরি অবস্থার প্রায় পুরো সময়টাই (২১ মাস) জেলে কাটাতে হয়েছিল, তখন তাকেও এই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল। মাস তিনেকের মাথায় তাঁকে শর্তাধীন মুক্তির প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল— 'শুধুমাত্র' তার সম্পাদিত পত্রিকাটি ('*অনীক*') বন্ধ করে দেবার শর্তে। সেই প্রস্তাব স্বভাবতই প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। আজকেও আদর্শবান কোনো বন্দী রাজনৈতিক কর্মী মুক্তি পেলে জেলের বাইরে গিয়ে 'অশান্তি' না করার বা 'গন্ডগোল না পাকাবার' 'নিশ্চিতি' দিয়ে তার বিনিময়ে মুক্তি পেতে রাজী থাকবেন— এমন কথা ভাবাটাই আসলে তাঁদের প্রতি জঘন্য অপমান। তাই, দুঃখিত, 'আপাতত' সেটাকে প্রাথমিকভাবে 'আশার আলো' বা 'রূপোলি রেখা' হিসেবে গ্রহণ করতে আমরা পারছি না।

আর সে কারণেই রিভিউ কমিটি কত 'যোগ্যতম' ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরি হয়েছে, সেটা আদৌ বিচার্য বিষয় হতে পারে না। তবে কোনো সরকারি কমিটিতে যাওয়া উচিত কিনা, এ নিয়ে কেউ বিতর্ক তুলেছেন বলে জানি না, তাই সে ব্যাপারে পুস্তিকাটিতে অযথা বাক্য ব্যয় করা হয়েছে। আমাদের বক্তব্য একটাই : কমিটির টার্মস্ অফ রেফারেন্স আপত্তিকর না হলে স্বাধীন সত্তা বজায় রেখে যাওয়া যেতেই পারে, তবে তা আপত্তিকর বা অপমানজনক হলে যাওয়ার যুক্তি নেই; কিংবা গেলেও প্রথমেই সেই শর্ত বাতিল করার জন্য সরকারের কাছে দাবি তোলা উচিত, রাজি না হলে তৎক্ষণাৎ পদত্যাগ করে বেরিয়ে আসা উচিত। আর কমিটি যদি তবুও সবার নিঃশর্ত মুক্তির ব্যবস্থা করতে পারে, তবে বিনা দ্বিধায় তাকে অভিনন্দন জানাবো— কিন্তু সব সময় নীতিগতভাবে ও বাস্তবত মূল আস্থাটা রাখবো গণআন্দোলনের উপর, আন্দোলনকেই মূল ও নির্ধারক বিষয় হিসেবে সর্বাধিক গুরুত্ব দেবো।

৮) পুস্তিকাটিতে কিন্তু এই রিভিউ কমিটির শেষ তিনটি শর্ত নিয়ে যে প্রশ্ন আছে, তা স্বীকার করে নিয়ে প্রথম দুটি সম্পর্কে বলা হয়েছে : সেগুলির 'কার্যকারিতা প্রায় নেই বললেই চলে'। কে সেটা ঠিক করলো? কমিটির অধিকারই নেই সেগুলি পাল্টে দেবার বা অকার্যকর করার। একমাত্র কমিটির স্রষ্টা, অর্থাৎ সরকারই পারে গেজেট বিজ্ঞপ্তি দিয়ে সেটা পাল্টাতে।

অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে, অন্তত তৃতীয় আপত্তিকর শর্তটিকে (অন্যদেরকে মুক্তির পর অপরাধ করতে উস্কানি দেবার সম্ভাবনা) তাঁরাও আপত্তিকর বলে স্বীকার করেছেন, বলেছেন : "আপত্তি অবশ্যই জানাতে পারি। কমিটিতে আমাদের পরিচিত সদস্যদের কাছেও আপত্তির কারণ জানিয়ে কমিটিতে আপত্তি জানানোর অনুরোধ করতেই পারি।" বন্ধুদের অবশ্য ধন্যবাদ জানাই এ জন্য যে, তাঁদের প্রায় ২৫০০ শব্দের ওই পুস্তিকাটিতে অন্তত আড়াইটি লাইন (অর্থাৎ ০.০০১ শতাংশ) তাঁরা সরকারি শর্ত সম্পর্কে আপত্তি জানাবার জন্য ব্যবহার করেছেন! কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি (আবার অপরাধমূলক কাজে প্রবৃত্ত হবার সম্ভাবনা) তাঁদের কাছে আপত্তিকর কিনা পরিষ্কারভাবে বোঝা গেল না। এবং সেটাই হচ্ছে সমস্যা। গুণগত তথা নীতিগত বিচারে চরম অপমানকর বিষয় সম্পর্কে হয় তাঁরা নীরবতা অবলম্বন করছেন, কিংবা আপত্তি করার শুধু প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।

এর পরেও কিন্তু আমরা আশা করবো, সবাই সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন, এবং আমরা সবাই মিলে অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধ ও সরকার-নিরপেক্ষ বন্দীমুক্তি আন্দোলনের পতাকাকে উঁচুতে তুলে ধরতে পারবো।

সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর নিঃশর্ত মুক্তি চাই

❑

পশ্চিমবঙ্গ থেকে যৌথবাহিনী প্রত্যাহার করো

❑

কালা আইন ইউএপিএ-র প্রয়োগ পশ্চিমবঙ্গে বন্ধ করো

This document was created using SOLID CONVERTER PDF To remove this message, purchase the product at www.SolidDocuments.com